প্রমীলা
স্মৃতিকথা সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা

বিজিত ঘোষ

প্রথম খণ্ড

সেকালে বিখ্যাত, একালে বিস্মৃত
১০ জন লেখিকার ১০টি স্মৃতিকথা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা	ড. বিজিত ঘোষ	০৯
আমার জীবন	রাসসুন্দরী দাসী	৭৩
আত্মকথা	সারদাসুন্দরী দেবী	১৪৯
ডায়েরী	কৈলাসবাসিনী দেবী	১৮৩
পূর্ব্বকথা	প্রসন্নময়ী দেবী	২১৩
আমার কথা	বিনোদিনী দাসী	২৮৯

ভূমিকা

মেয়েদের পড়াশোনা শেখা শুরু হল এই তো সেদিন! দিনটা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে। ভারতে প্রথম বাংলায় সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সরকারি শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনিই নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। প্রবর্তন হল বাংলায় মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষার।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভদ্রলোক মাত্রেই অনুভব করতে পারছিলেন সে-সময়। সেই প্রেক্ষিতেই রাজা রাধাকান্ত দেব নিজগৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৫-এ আর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রবর্তন করেন উত্তরপাড়ার জমিদার। বারাসতের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা স্থাপন করেন আরও একটি বালিকা বিদ্যালয়।

১৮৪৯-এর ৭ মে, বেথুন ও বিদ্যাসাগরের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।' বেথুন-এর মৃত্যুর (১৮৫১) পর সেটি বিদ্যাসাগরের একক পরিচালনায় বেথুন স্কুল নামেই স্থায়িত্ব লাভ করে।

অবশ্য বিদ্যাসাগর ও বেথুনের অনেক আগেই ইংরেজ মিশনারিগণ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেটা ১৮১৮-১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। ওই সময়েই 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে একটি খ্রিস্টান মহিলা সমিতির প্রচেষ্টায় আটটি মেয়েদের স্কুল চালু হয়। শুধু এ-গুলিই নয়, ১৮২২ থেকে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে আরও ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'।

রক্ষণশীল হিন্দুরা মেয়েদের পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত রাখতে চেয়েছে বরাবর, সেকালে। সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায় তাই এ-বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রবন্ধে।

আগেই বলেছি, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেবের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। তাতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াশীলদের চটে যাওয়ার সরস বর্ণনা পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধে।

রক্ষণশীলগণ গেল-গেল রব তুলতে থাকেন। 'এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।' মেয়েদের শিক্ষা দিলে, তাদের অবরোধ মোচন করলে, তারা আর স্বামী, গুরুজনদের কথা শুনবে না। যে বছর বিয়ে হয় কৈলাসবাসিনীর, মোটামুটি সে সময়েই আধুনিক কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই ভাবনাটিকেই প্রকাশ করেছিলেন বেশ রং চড়িয়ে।

আধুনিকা শিক্ষিতা বঙ্গনারীদের আদৌ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে না পারা কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখে ফেললেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা। প্রবাদের মতো পরিচিতি পাওয়া তাঁর সেই কাব্য পঙ্‌ক্তি :

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ. বি শিখে বিবি সেজে, বিলিতি বোল কবেই কবে।

তবে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন জানিয়ে পরে তো বটেই, আগেও কিছু লেখালিখি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক' গ্রন্থটি। সেখানে গ্রন্থকার লিখেছেন—'এদেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না বরং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরবসিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।' পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর তর্করত্ন (হেয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থকার) স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার সমর্থনে লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' নামের গ্রন্থটি। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা চলে, দ্বারকানাথ রায়ের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধান', রামসুন্দর রায়ের 'স্ত্রীধর্ম বিধায়ক' প্রভৃতি প্রগতিশীল প্রবন্ধগুলির কথা। আর সবার উপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখের প্রচেষ্টায় তখন বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য-গ্রন্থ লেখিকা কৈলাসবাসিনী গুপ্ত জন্মেছিলেন ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৯-এ বারো বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। পরবর্তীকালে পড়াশোনা শিখে তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'হিন্দু ফিমেলস বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩), 'হিন্দু মহিলাকুলের বা অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫) এবং পদ্যে-পদ্যে রচিত 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৫) ইত্যাদি।

কৈলাসবাসিনী গুপ্ত সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায় না তাঁর সঠিক মৃত্যু-তারিখও। তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। তাঁরই কাছে লেখাপড়া শিখে পূর্বোক্ত গ্রন্থ তিনটি রচনা করেন কৈলাসবাসিনী।

তাঁর রচিত 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কেননা, এখানে তিনি কেবল নিজের কথাই লেখেননি; পাশাপাশি সে-কালের হিন্দু স্ত্রী-জাতির সামাজিক অবস্থার সহজ সরল সরস বর্ণনাও দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে গ্রন্থটিকে সমকালীন সমাজের একটি বিশ্বস্ত চিত্র বলা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গদ্য-গ্রন্থের হিন্দু মহিলা লেখক যদি হন কৈলাসবাসিনী গুপ্ত, তাহলে প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা হিসেবে উল্লেখ করতে হয় বিবি তাহেরন নেসার কথা (১৮৪৭/১৮৫৮)। অবশ্য আনিসুজ্জামান-এর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে আমরা ফয়জুন্নেসা চৌধুরী নওয়াব (১৮৪৭/৪৮-১৯০৫)-এর 'রূপজালাল' (১৮৭৬) গ্রন্থের উল্লেখ পাই। এই গ্রন্থটি বেগম রোকেয়ার জন্মেরও (১৮৮০) চার বছর আগে প্রকাশিত হয়। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন নোয়াখালি জেলার পশ্চিম গাঁ-এর জমিদার। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে প্রভূত অর্থ দান করে গেছেন তিনি। তাঁকে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। এই সম্মানিত উপাধি ভারতবর্ষের আর কোনো মহিলা পাননি। ফয়জুন্নেসার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রূপজালাল' সুললিত গদ্য ও পদ্য ছন্দে রচিত। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ গ্রন্থটি বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবনের এক করুণ রূপক কাহিনি।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, কৈলাসবাসিনী গুপ্তই প্রথম গদ্য গ্রন্থের হিন্দু মহিলা লেখক। প্রথম মহিলা গদ্যরচনাকার কৈলাসবাসিনী গুপ্তের 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' প্রকাশিত হয় সেকালের 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে।

এর ঠিক এক বছর পর, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকায় শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর একটি পত্র প্রকাশিত হয়। সেটিকে তাঁর এক অসামান্য দৃপ্ত আত্মকথাই বলা যেতে পারে।

তারও একবছর পর, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত প্রকাশিত হয়। রাসসুন্দরী দাসীর (১৮০৯-১৮৯৯) 'আমার জীবন' । বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের প্রথম আত্মজীবনী।

রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-১৮৯৯)

বাংলা ভাষায় প্রথম আত্মচরিত লিখে একটা ঐতিহাসিক কাজ করে গেছেন শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসী। রাসসুন্দরী দাসী জন্মগ্রহণ করেন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। পূর্ববাংলার পাবনা জেলার পাতাজিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামের সরকার পরিবারে রাসসুন্দরীর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। তাঁর লেখা অসামান্য আত্মচরিতটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে।

বিবাহের সময় রাসসুন্দরী দাসী ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। বহু সন্তানের জননী ছিলেন রাসসুন্দরী। বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী রাসসুন্দরীর গৃহে পড়াশোনার কোনোরকম পরিবেশ ছিল না। সেই চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও নিজের অদম্য আগ্রহ, নিষ্ঠা আর আন্তরিক তাগিদে রাসসুন্দরী নিজে নিজেই পড়তে শেখেন। লিখতে শেখেন। এ এক অসাধ্য সাধন। শ্রদ্ধায় অবনত হতে হয় তাঁর এই কর্মোদ্যম দেখে। নিজের শিশুপুত্রের (কিশোরীলাল সরকার) সঙ্গে তিনি পড়তে শেখেন পঁচিশ বছর বয়সে। আর লিখতে শেখেন পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে। সে সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ব্যাপারটা ছিল ভয়ংকর দোষের। তারই মধ্যে নিজের চেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরে বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি লেখাপড়া শেখেন। আমাদের মনে হয় রাসসুন্দরীর আন্তরিক ধর্মপিপাসা থেকে, ধর্মপুস্তক পড়ার আগ্রহেই লেখাপড়া শেখার অনুপ্রেরণা।

'আমার জীবন' বাংলা সাহিত্যের কেবল প্রথম আত্মচরিতই নয়। এটি একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থও বটে। এখানে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার নিখুঁত ছবি ধরা পড়েছে। এই গ্রন্থে রাসসুন্দরী দাসীর বিশেষ কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

আশৈশবের আরাধ্য দেবতা মদনমোহনকে উদ্দেশ করে রাসসুন্দরী দাসী লিখেছেন :

জন্মিয়া ভারতভূমে, মজিয়া মোহের/ঘুমে/হেলায়,
হারাই চিরদিন।/না পাই উপায় তার,
কোথা প্রভু বিশ্বধর/দয়া কর আমি যে সুদীন।

জীবন-সায়াহ্নের সেই চরম বাস্তব চিত্র ('দেহ পট সনে নট সকলি হারায়'), নিজের জীবনকে অবলম্বন করেই লিখেছেন রাসসুন্দরী দাসী।

'দেহটি আমি যে কর্ম ইচ্ছা করিতাম, সেই কর্মেই লাগিত।' কিন্তু ক্রমশ তা ভাঙতে শুরু করে।

চলিতে শকতিহীন জীর্ণ কলেবর।
স্থানে স্থানে হচ্ছে বাঁকা লম্বিত অধর।।

লোল চর্ম ক্রমে হ'ল শিরে শুক্ল কেশ।
সর্বাঙ্গে ভঙ্গী কি বলিব আমি আর।
দিনে দিনে হচ্ছে মম বিকৃত আকার॥

রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর ঊনষাট বছর বয়সে। কবি ও গীতিকার হিসেবেও তিনি যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, 'আমার জীবন' গ্রন্থে তার যথেষ্ট পরিচয় মেলে। 'আমার জীবন' কেবল রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা বা স্মৃতিকথাই নয়; সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা, বিশেষ করে সমকালের মেয়েদের জীবনযাত্রা, অন্তঃপুরের বহু অনুপুঙ্খ চিত্রও এখানে চমৎকার ফুটে উঠেছে। এই অসামান্য নারীর মৃত্যু হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে।

শ্রীমতী রাসসুন্দরী লিখিত 'আমার জীবন' গ্রন্থটি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন : 'পুস্তিকাটিতে লেখিকা তাঁহার ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত শরীরের ও মনের অবস্থা এবং জীবনের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী আঠাশ বৎসরের কথা দ্বিতীয় ভাগে দিয়াছেন। উক্ত বৈষ্ণবঘরের কন্যা ও বধূ লেখিকার ভগবৎপরায়ণ চিত্তের পরিচয় বইটির ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত রসে লেখিকার মন সিক্ত ছিল। বইটিতে স্বরচিত কবিতা দুই-চারি ছত্র করিয়া মাঝে মাঝে উদ্ধৃত আছে। রচনাটি অতিশয় উপাদেয়। রাসসুন্দরীর শিক্ষিতাভিমান ছিল না, তাই কোথাও নিজেকে প্রকাশ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই।'

'আমার জীবন' গ্রন্থমধ্যে রাসসুন্দরী দাসী লিখেছেন : '১২১৬ সনে চৈত্রমাসে আমার জন্ম হইয়াছে, এক্ষণে ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর।'

চোদ্দো বছর বয়সে রাসসুন্দরী লুকিয়ে পুথি পড়া শিখতে আরম্ভ করেন। বারোটি সন্তানের জননী হওয়ার পর পুথি পড়া শেখা সম্পূর্ণ করেন।

'আমার জীবন' সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : 'ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকা যায় না।...ইঁহার আত্মজীবনী পড়িয়া মনে হয় ইনি একজন আদর্শ-রমণী। যেমন গৃহকর্মে নিপুণা, তেমনি ধর্মপ্রাণ ও ভগবদ্‌ভক্ত। শৈশবে ইনি অতিশয় ভীরুস্বভাব ছিলেন। সেই সময়ে ইঁহার জননী ইঁহার ভয় নিবারণার্থ ইঁহাকে একটি অভয় মন্ত্র প্রদান করেন। সেই অবধি, সেই অভয় মন্ত্রটি অক্ষয় কবচরূপে তাঁহাকে চিরজীবন রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন, —'ভয় হইলেই দয়ামাধবকে ডাকিও!' শোকে, তাপে, ভয়ে, এই মন্ত্রটিই তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। আজকাল 'ধর্মশিক্ষা করিয়া খুব একটা হই-চই উঠিয়াছে, আসল কথা, মা শিশুর সুকুমার হৃদয়ে শৈশবে ধর্মের বীজ রোপণ করিলে যেরূপ সুফল হয়, পরে শত শত ধর্মগ্রন্থ পাঠেও তাহা হয় না। ইঁহার জীবনের আর একটি বিশেষত্ব—লেখাপড়া শিখিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ।

নভেল নাটক পড়িতে পারিবেন বলিয়া নহে—পুথি পড়িতে পারিবেন বলিয়াই—'চৈতন্য ভাগবত' পড়িতে পারিবেন বলিয়াই লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ।

ইঁহার ধর্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পর্যবসতি নহে, ইঁহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন; এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। এরূপ উন্নত ধর্মজীবন সচরাচর দেখা যায় না।

এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা আবশ্যক। এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।'

রাসসুন্দরী দাসী

(১৮০৯ — ১৮৯৯)

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে, ১৮১০) পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রাসসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। রাসসুন্দরী মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহীন হন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের জমিদার সীতানাথ সরকারের (শিকদার) সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। রাসসুন্দরীর সন্তানদের মধ্যে কিশোরীলাল সরকার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হিসেবে। সাহিত্যচর্চায় সুনাম করেছিলেন তাঁর পৌত্রী শ্রীমতী সরলাবালা সরকার। বাঙালি নারীর বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম আত্মজীবনী **আমার জীবন** রাসসুন্দরীর একটি অনবদ্য স্মৃতিকথা। নিজের জন্ম ও এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটির প্রকাশকাল বিষয়ে স্বয়ং রাসসুন্দরী দেবী লিখে গেছেন, '১২১৬ সালে চৈত্রমাসে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বহি ১২৭৫ সালে যখন প্রথম ছাপা হয় তখন আমার বয়ঃক্রম ঊনষাইট বৎসর'। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন (মতান্তরে ১৯০০)।

॥ আমার জীবন ॥

মঙ্গলাচরণ

বন্দে সরস্বতী মাতা, তুমি বল বুদ্ধিদাতা,
গন্ধর্ব কিন্নর তব বাধ্য।
সদয় হইয়া মনে, বৈস মম হৃদাসনে,
প্রণমিব পদে যথাসাধ্য।।
অবোধ অবলা কন্যা, নিজগুণে কর ধন্যা
যাতে মম পুরে অভিলাষ।
এই আশা করি মনে, তব প্রিয়পতি সনে,
আমার কণ্ঠেতে কর বাস।

প্রথম রচনা

জীবন-চরিত

কোথা বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বেশ্বর।
হৃদয়ে বসিয়া মম বাঞ্ছা পূর্ণ কর।।
অজ্ঞান অধম আমি তাহে নারী ছার।
তব গুণ বর্ণিবারে কি শক্তি আমার।।
তবু তব কীর্তন করিতে সাধ মনে।
রাসসুন্দরীকে দয়া কর নিজগুণে।।

১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম অষ্টাশি বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।

আমার এই শরীর, এই মন, এই জীবনই কয়েক প্রকার হইল। আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, কোন্ সময়ে কী প্রকার ছিল, এবং কোন্ অবস্থায় কত দিবস গত হইয়াছে, সমুদয় আমার স্মরণ নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমার মনে আছে, তাহাই লিখিতেছি :

চারি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব কী প্রকার ছিল, তাহা আমি কিছুই জানি না; সে সমুদয় আমার মা জানেন। পরে যখন আমি ছয় সাত বৎসরের ছিলাম তখনকার কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। যাহা আমার মনে আছে তাহাই লিখিতেছি। তখন আমি প্রতিবাসিনী বালিকাদিগের সঙ্গে ধুলা-খেলা করিতাম। ওই সকল বালিকা বিনা অপরাধেই আমাকে মারিত। আমার মনে এত ভয় ছিল যে, আমি মার খাইয়াও বড়ো করিয়া কাঁদিতাম না, কেবল দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইত। আমার যদি অতিশয় বেদনা হইত সে জন্যও কতক কাঁদিতাম, কিন্তু আমার কাঁদার বিশেষ কারণ এই, যে আমাকে মারিয়াছে, আমাদের বাটীতে সকলে শুনিলে উহাকে গালি দিবেন। আর একটি কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিতাম : এক দিবস আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি কোনোখানে যাইও না। তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মা! যাব না কেন? তখন আমার মা বলিলেন আজ বড়ো ছেলেধরা আসিয়াছে, সে ছেলে পাইলে ছালার মধ্যে

পুরিয়া লইয়া যায়। মার ওই কথা শুনিয়া আমার মনে এত ভয় হইল যে, আমার এককালে মুখ শুকাইয়া গেল। আমার ওই সকল ভয়ের লক্ষণ দেখিয়া আমার মা তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, যাট, তোমার ভয় নাই। সে সকল ছেলে দুষ্টামি করে এবং ছেলেপিলেকে মারে, ওই সকল ছেলেকে ছেলে-ধরায় লইয়া যায়। তোমার ভয় কী, তোমাকে লইয়া যাইবে না।

মার ওই কথা আমার মনে মনেই থাকিল। যখন কোনো ছেলে আমাকে মারিত, তখন মার ওই কথা আমার মনে পড়িত। মা বলিয়াছেন যে ছেলে ছেলেপিলেকে মারে তাহাকে ছেলে-ধরায় ধরিয়া লইয়া যায়। অতএব যখন কোনো ছেলে আমাকে মারিত, তখন ভয়ে আমি বড়ো করিয়া কাঁদিতাম না। উহাকে ছেলে-ধরায় ধরিয়া লইয়া যাইবে, কেবল এই ভয়ে দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। আমাকে মারিয়াছে এই কথা কাহারও নিকট বলিতাম না। আমি কাঁদিলে কেহ শুনিবে এই ভয়ে মরিতাম। সকলে জানিত, আমাকে মারিলে আমি কাহারও নিকট বলিব না। আমি সকল বালিকাকে ভয় করিতাম, এজন্য গোপনে গোপনে সকলেই বিনা অপরাধে আমাকে মারিত।

এক দিবস আমার সঙ্গিনী একটি বালিকা আমাকে গোপনে বলিল, তোমার মায়ের কাছে গিয়া জলপান চাহিয়া আন। আমরা দুই জনে গঙ্গাস্নানে যাই। শুনিয়া আমি ভারী আহ্লাদিত হইয়া মায়ের নিকট গিয়া বলিলাম, মা! আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। মা হাসিয়া বলিলেন, গঙ্গাস্নানে যাইবে, কী চাও। আমি বলিলাম, একটা বোঁচ্‌কা চাই। গঙ্গাস্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না; এই মাত্র জানি, পথে বসিয়া জলপান খায়, আর কাপড়ে একটা বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া মাথায় করিয়া পথে হাঁটিয়া যায়। আমার মা আমার ওই সকল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একখানি কাপড়ে কিছু জলপান, দুটি আম বাঁধিয়া একটি পুঁটলি করিয়া আমাকে আনিয়া দিলেন। তখন ওই পুঁটলি দেখিয়া আমার মনে যে কী পর্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হইল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এখন তাহার শত গুণ বেশি আহ্লাদের কাজ হইলেও তেমন আহ্লাদ মনে বোধহয় না। আহা! সে যে কী আহ্লাদের দিন ছিল তাহা বলা যায় না। তখন আমি ওই পুঁটলি লইয়া সেই বালিকার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। পরে এক পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া জলপান খুলিলাম। তখন আমার সঙ্গিনী বালিকা আমাকে বলিল, দেখো, তুমি যেন আমার মা, আমি যেন তোমার ছেলে। তুমি আমাকে কোলে লইয়া খাওয়াইয়া দাও। তখন আমি বলিলাম, তবে তুমি আমার কোলের কাছে বইস। তখন সে আমার কোলের কাছে বসিল। আমি বলিলাম, আচ্ছা তবে খাও। এই বলিয়া ওই সকল জলপান উহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে সে বলিল আঁচাইয়া দাও। তখন আমি ভারী বিপদে পড়িলাম। কী করিব ভাবিতে লাগিলাম। আমি জলে নামিয়াও জল আনিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কোনো মতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। আমার সঙ্গিনী ওই অপরাধে আমাকে একটা চড় মারিল। আমি মার খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি অমনি দুই হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যে, আমাকে মারিতে কেহ বুঝি দেখিল, এই ভয়ে আমি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম।

ওই সময়ে আমার খেলার সঙ্গিনী আর একটি বালিকা সেই স্থানে ছিল। সে উহাকে বলিল, তুমি কেমন মেয়ে! উহার সকল জলপান খাইলে, আম দুটাও খাইলে, আবার উহাকে মারিয়া কাঁদাইতেছ। আমি গিয়া উহার মায়ের নিকট বলিয়া দিই। এই বলিয়া সে আমাদের বাটীতে গিয়া সকলের নিকট বলিয়া পুনর্বার আমাদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি তোমার মায়ের কাছে সকল

কথা বলিয়া দিয়াছি। দেখ এখন, কী করে। ওই কথা শুনিয়া আমার ভারী ভয় হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনী বালিকা বলিল, উনি একটি সোহাগের আরশি, কিছু না বলিতেই কাঁদিয়া উঠেন! এই বলিয়া আমাদের মুখে আর একটা ঠোকনা মারিল। তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল, আমি চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি সোহাগের আরসী হইয়াছি, না জানি, আমার কী হইল! তখন আমার এই ভয়ই হইতে লাগিল, আজ আমাকে ছেলেধরা ধরিয়া লইয়া যাইবে, উহাকেও বুঝি লইয়া যাইবে। এই ভয়ে আমি আমাদের বাটীতে না গিয়া ওই গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনীর বাটীতেই গেলাম। তখন উহার মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া উহাকে বলিল, উহার মুখ লাল হইয়াছে কেন? তুমি বুঝি উহাকে কাঁদাইয়াছ? এই বলিয়া তাহার মা তাহাকে গালি দিল। সে তাহার মায়ের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। পরে তাহার মা গেলে, সে আমাকে বলিল, দেখ, আমার মা আমাকে গালি দিল, আমি তো তোমার মতো কাঁদিলাম না। তুমি যেমন আহ্লাদে মেয়ে হইয়াছ। তুমি বুঝি তোমার মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিবে। তখন আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, না, আমি মায়ের কাছে গিয়া কিছুই বলিব না; ইহা বলিয়া আমি বিষণ্ণবদনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাটী হইতে একজন লোক আসিয়া আমাকে বাটী লইয়া গেল। আমি বাটী গিয়া দেখিলাম, সকলেই আমার ওই সকল কথা বলিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গঙ্গাস্নান হইয়াছে বলিয়া আরও হাসিতে লাগিল। তখন আমার খুড়া, দাদা এবং অন্যান্য সকলেও বলিতে লাগিলেন, আর এ সকল মেয়েদের সঙ্গে উহাকে খেলিতে দেওয়া হইবে না। কল্য হইতে উহাকে বাহির বাটীতেই রাখা যাইযে! তখন সে একদিন ছিল, এখনকার মতো ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখাপড়া করিত। একজন মেমসাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কালো রঙের একটা ঘাগরা পরাইয়া একখানা উড়ানি গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, আমি সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম। ভয়ে আমি আর কোনো দিকে নড়িতাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর। তখন আমার শরীরের অবস্থা কী প্রকার ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সকলে যাহা বলিত, যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি :

বর্ণটি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল।
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি।
বলিত সকলে মোরে সোণার পুতুলী।।

আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। আমার মুখে পরিষ্কৃত হইয়া কথা বাহির হইত না। যে দুই একটি কথা বাহির হইত, সেও আধো-আধো, তাহা শুনিয়া সকলে হাস্য করিত। আমাকে যদি কেহ বড়ো করিয়া ডাকিত, তাহা হইলেই আমার কান্না উপস্থিত হইত। বড়ো কথা শুনিলেই, আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। এজন্য আমার সঙ্গে কেহ বড়ো করিয়া কথা কহিত না, আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। মেয়েছেলের মতো আমাকে বাটীর মধ্যে রাখা হইত না। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষরে মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ওই সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়ই থাকিতাম। আমি মনে মনে ওই সকল পড়াই শিখিলাম। সেকালে পারসি পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে ওই সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না। আমাকে পরিজনেরা সমস্ত দিন

বাহিরে রাখিতেন। কেবল স্নানের সময়ে বাটীর মধ্যে আনিয়া স্নান আহারের পরেই আবার বাহিরে রাখিয়া আসিতেন, আর সন্ধ্যার পূর্বে বাটীর মধ্যে আনিতেন। এই প্রকার সকল দিবস আমি স্কুলে মেমসাহেবের কাছেই বসিয়া থাকিতাম। তখন আমার মনের অবস্থা কী প্রকার ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ভয় যেন আমার মন এককালে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যদিও মনে কখনও একটু অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত, অমনি ভয় আসিয়া চাপা দিয়া রাখিত।

দ্বিতীয় রচনা

ধন্য ধন্য প্রভু তুমি ধন্য ত্রিভুবনে।
কত ধন্যবাদ দিব এ এক বদনে।।
ধন্য তব দয়া, ধন্য নিয়ম তোমার।
ধন্য তুমি মায়ারূপে বেপেছ সংসার।।
ধন্য তব অপরূপ সৃষ্টি মনোহারী।
ধন্য তব কৌশলের যাই বলিহারি।
ধন্য এই চন্দ্র সূর্য ধন্য বসুমতী।
ধন্য পশু পক্ষী ধন্য বৃক্ষ বনস্পতি।।
কত মনোহর রূপে পৃথিবী উজ্জ্বল।
তাহে পবনের গতি অতি সুশীতল।।
সুরধুনি-প্রবাহিণী নদী শত শত।
সৌরভ-বাহিনী কত বর্ণিব বা কত।।
রাসসুন্দরীর জন্ম ধন্য করি গণি।
শ্রবণে পরশে তব নামামৃত ধ্বনি।

এক দিবস আমার খুড়া বাহির বাটী হইতে আমাকে বাটীর মধ্যে আনিতেছেন, ওই সময়ে একজন গোবৈদ্য একখানা ছালে ঘাড়ে করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া ছেলেধরা ভাবিয়া ভয়ে এককালে মৃতপ্রায় হইলাম। তখন আমার মনে এত ভয় হইয়াছিল যে, আমি দুই হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সে স্থানে যত লোক ছিল, তাহারা আমাকে ভয় নাই, ভয় নাই বলিয়া হাসিয়া মহাগোল করিতে লাগিল। আমার খুড়া আমাকে কোলে লইয়া বাটীর মধ্যে গিয়া বলিলেন, আজ ভালো ছেলে-ধরার হাতে পড়িয়াছিলাম; এই বলিয়া তিনি এবং সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

তখন আমার মায়ের কাছে গিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমার এত ভয় কেন? ভয় নাই, কীসের ভয়, ছেলে-ধরা নাই, ও সকল মিছা কথা, আমাদের দয়ামাধব আছেন, ভয় কী? তোমার যখন ভয় হইবে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না। মার ওই কথাতে আমার মনে অনেক সাহস হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মা বলিয়াছেন ছেলে-ধরা নাই, আর আমাদের দয়ামাধবও আছেন, এই বলিয়া কিছু স্থির হইলাম। বিশেষ আমি একাও কোনোখানে যাইতাম না। আমার সঙ্গে লোক থাকিত। বাস্তবিক আমার মতো ভয় কোনো ছেলের দেখা যায় না। এমনকি, বুড়া মানুষ দেখিলেই আমার দাঁত লাগিত, এজন্য আমাকে একা রাখা হইত না। আমার এক পিসি ছিলেন; তিনি অতি অল্পকালেই বিধবা হন। আমার বুদ্ধির অগোচরে তিনি বিধবা